বাদাবনের বিজ্ঞান

পাভেল পার্থ

উৎসর্গ

নিদু মোড়ল, নীলডুমুর, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।
বিখ্যাত গুনিন ছিলেন। বনের বাঘকে কাছে ডেকে এনে মাছ খাওয়াতেন, গোলপাতা বিছিয়ে ঘুম পাড়াতেন। প্রবীণ বয়সে বাঘের কামড়ে মারা যান।

কবিরাজ সুশীল মণ্ডল, পূর্ব কালিনগর, মুন্সীগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।
সুন্দরবনের বাঘের আক্রমণে আহত রোগীর বিখ্যাত চিকিৎসক। এ পর্যন্ত বাঘে ধরা প্রায় ১৫০ এবং কুমির ও কামটে কাটা প্রায় ২০ জন মানুষের চিকিৎসা করেছেন। তাঁর চিকিৎসাবিদ্যা জানতে ইতালি, জাপান ও ইউরোপ থেকে অনেকে বাংলাদেশিদের সাথে এসে চাপ দিয়েছে অনেকবার। তিনি এই বিদ্যা সুরক্ষা করেছেন।

প্রতিটি জ্ঞানকাণ্ডই একটা মত নিয়ে হাজির হয়, যেখানে লেপ্টে থাকে বাহাদুরি, বাণিজ্য আর বারুদের ঝাঁজ। যা অস্বীকার করে বিরাজিত আরো নানা জ্ঞানভাষ্য ও বিবাদ। জুলুম আর জবরদস্তি বহাল রেখে যা অনিবার্য হয়ে ওঠে। বিজ্ঞান যেখানে দলিত আর দর্শন বিশৃঙ্খল। তো, জ্ঞানকাণ্ডের এই অধিপতি প্রশ্নহীন ময়দানে চলতি আলাপখানি শুরু হচ্ছে সুন্দরবন নিয়ে । সুন্দরবনকে সচরাচর পাঠ করা হয় কিভাবে? সুন্দরবনকে সচরাচর আমরা পাঠ করি অধিপতি জ্ঞানকাণ্ডের ব্যাকরণ ও ভাষ্যে। 'একক আয়তনে দুনিয়ার বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন', 'বিশ্ব ঐতিহ্য', 'রামসার এলাকা', 'বাংলা বাঘ ও ইরাবতী ডলফিনের বৃহৎ বিচরণস্থল' কিংবা 'সংরক্ষিত বনাঞ্চল'। প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানকাণ্ডে সুন্দরবনকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এমন সব তকমায়, যা এই জনপদের অরণ্যদর্শন থেকে এই বনকে এক বিচ্ছিন্ন, অনৈতিহাসিক ও অপর অঞ্চল বানিয়ে রেখেছে। রাজা প্রতাপাদিত্যের রাজধানী হিসেবে দক্ষিণবঙ্গের এই অঞ্চলটি পরিচিত হলেও মৌলঙ্গী নামের এক পেশাজীবী জনগোষ্ঠী যে এই বনাঞ্চলে নদীর পানি থেকে লবণ তৈরির কারিগরি বিকশিত করেছিল, সেই হদিস একেবারেই মুছে ফেলা হয়েছে। তার বাদেও সুন্দরবনকে আগলে বিকশিত হয়ে চলেছে এক জটিল সংসার। কেবল বাঘ, বনবিবি, বাগদা, বাউলে লতা নয়, এই সংসারের বাসিন্দা সুন্দরবননির্ভর বনজীবীরাও। বনজীবীরা নিজেদের পরিচয় দেয় 'বাদা করা লোক' হিসেবে, কখনো মৌলে-বাউলে। মৌয়ালি, বাওয়ালি, চুনারি, জোংরাখুটা, মাঝি, জেলে। এদের কেউ বন থেকে মধু ও মোম সংগ্রহ করে, কেউ গরানের ছিটে, কেউ গোলপাতা, কেউ মাছ, কেউ জোংরা। এই মানুষদের জন্ম কি মরণ–সবই এই বনের কোলে। শহরের ধনী মানুষরা বড় বড় চিংড়ি মাছ খাবে বলে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক আর বিশ্বব্যাংকের চোখরাঙানিতে বনের আশপাশের সব গ্রাম হয়ে যায় বাণিজ্যিক চিংড়িঘের। ক্ষেত-কৃষি হারিয়ে দিশেহারা মানুষ নামে বনের জোয়ার-ভাটায়। চিংড়ি পোনা ধরা শুরু হয়, এখন বাচ্চা কাঁকড়া।

তো, হাজার বছর ধরে এই অরণ্যগর্ভে জন্ম নিয়ে টিকে আছে যে বনজীবী জনগণ, তারা কিভাবে বহুল আলোচিত সুন্দরবনকে পাঠ করে? বনজীবী জনগণের জ্ঞানভাষ্যে সুন্দরবন কেমন? এমন প্রশ্ন কি আমরা করেছি কখনো? তাহলে বনজীবী নিম্নবর্গের সেই জ্ঞানভাষ্য কোথায়? সুন্দরবনের বনজীবী জ্ঞানভাষ্যের দুটি বিষয় কেবলমাত্র তথাকথিত মূলধারায় কিছুটা আলোচিত হয়। একটি হলো গাজীর গান এবং অন্যটি বনবিবির আখ্যান। মূলত এসব জ্ঞানভাষ্যের উপস্থাপন হয় সব সময় 'লোকসংস্কৃতির' মোড়কে, যাপিত জীবনের বিজ্ঞান হিসেবে নয়। একসময় পচাব্দী গাজীর বাঘ শিকারের কাহিনি শিশুশ্রেণির পাঠ্য হয়েছিল। পশ্চিম সুন্দরবন বিভাগের সাতীরা রেঞ্জের বুড়িগোয়ালিনীর সোরা এলাকার বিজ্ঞ বাওয়ালি পচাব্দী গাজীর অরণ্য অভিজ্ঞতা অধিপতি জ্ঞানকাণ্ডে পাঠের বিষয় হয়নি; হয়েছিল তাঁর বাঘ শিকারের কীর্তি। কারণ রাষ্ট্রবাহাদুর আর বন বিভাগের হুকুম পালন করেই তাঁকে বাঘ মারতে হয়েছিল। সেই বাঘ হত্যা সুন্দরবনের অরণ্যবিজ্ঞানের অংশ ছিল না। তার মানে, সুন্দরবনকে আমরা বরাবর দেখি এই বন-সংসার থেকে বহুদূরের কিছু অন্য মানুষের নির্দেশ ও উপস্থাপনায়। এমনকি বাঘ থেকে শুরু করে বন্যপ্রাণ গবেষণায় সুন্দরবনের আগত মহান গবেষকরা বরাবর স্থানীয় বনজীবীদের দিয়ে তাঁদের কাজ করান, বনজীবীদের সাথে বনে-বাদায় ঘুরে বেড়ান। বিস্ময়করভাবে বনজীবীদের কাছ থেকে জানা বন্যপ্রাণ সম্পর্কিত জ্ঞানভাষ্যই হয়ে ওঠে তাঁদের গবেষণা দলিল। সেসব দিয়ে তাঁদের বিদ্যায়তনিক ডিগ্রি হয়, নানা কিসিমের ক্যারিয়ার হয়। বই-পুস্তক ছাপা হয়। গবেষণার নামে সুন্দরবনের বনজীবীদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ডাকাতি হয়ে আজ কোথায় কতভাবে বিক্রি হচ্ছে, তার হদিস কে রাখে! চলতি আলাপ এই জ্ঞানডাকাতি বা নিম্নবর্গের মেধাস্বত্ব সুরা নিয়ে নয়। চলতি আলাপখানি সুন্দরবনের বনজীবীদের লোকায়ত অরণ্যবিজ্ঞানের কিছু নমুনাকে একত্র করে সুন্দরবন নিয়ে নিম্নবর্গীয় জ্ঞানকাণ্ডের ময়দানে শামিল হতে সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছে। পশ্চিম সুন্দরবনের সাতীরা রেঞ্জ, পূর্ব সুন্দরবনের চাঁদপাই ও খুলনা রেঞ্জের ধারেকাছের বনজীবীদের অরণ্যভাষ্য থেকে চলতি আলাপখানি শুরু হচ্ছে।

বাদাবন ও বনবিবি

সুন্দরবন স্থানীয়ভাবে বাদা বা বাদাবন, হুলোবন, শুলোবন, মাল, মহাল হিসেবে পরিচিত। বাদা মানে জোয়ার-ভাটা বয়ে যায় যে বনে। ব্রিটিশ উপনিবেশের সময় এই বাদার নাম হয়ে যায় মহাল। মধুমহাল, গোলমহাল। বনের একেক অংশে একেক বন্যপ্রাণের বিচরণ। বাদাবনে পাখিদের বিশেষ আবাসস্থলকে বাদাল বলে। সাতীরা রেঞ্জে চুনকুড়ি নদীর পাশে সুবদে-গোবদে খালের পাশে বাংলাদেশের বড় বাদাল। এক নদীর সাথে আরেক নদীর সংযোগ খালকে ভাড়ানি বলে। অনেক জায়গায় একে দুইনে বা দোনেও বলে। আবার এক মুখ বন্ধ খালকে জোলা বলে। বাদাবনের ভেতর হঠাৎ প্রাকৃতিকভাবে ফাঁকা জায়গাকে চটক বলে। চটক জায়গায় গেওয়া, পশুর, বাইন, কাঁকড়ার মতো বড়

বড় গাছ থাকে। বড় গাছের নিচে ঝোপজঙ্গল কম থাকে। চটক জায়গায় বাঘ কম থাকে। নদীর ভেতর হঠাৎ নতুন ছোট্ট চরে বন জন্ম নিলে তাকে টেক বলে। বাদাবনে নদীর তীর থেকে বনের ভেতর পর্যন্ত নানা গাছের নানা সারি। একেক গাছের একেক পরিবার। ধানী বা ধানচি চর থেকে শুরু হয়, তারপর তীর থেকে বনের ভেতরের দিকে থাকে হরগোজা, হেন্তাল, গোলপাতা, কেওড়া, বাইন, গেওয়া ও সুন্দরী। তুলনামূলকভাবে সাতীরা ও চাঁদপাই রেঞ্জে বাঘ, বনশূকর বেশি। এখানে মধুও বেশি। খুলনা রেঞ্জে সুন্দরী গাছ বেশি, সুন্দরীর শুলো বেশি বলে সেখানে বাঘ কম বিচরণ করে। খুলনা রেঞ্জে হরিণ বেশি। সাতীরা রেঞ্জে প্রবীণ কেওড়া, বাইন ও পশুর গাছের আধিক্য, আবার খুলনা রেঞ্জে সুন্দরীর। বাদাবনের রক্ষাকবচ হলেন মা বনবিবি। মা বনবিবি ও শাহজঙ্গলী ধর্মে মুসলিম, কিন্তু বাদাবনে তাঁরা পূজিত হন। তাঁদের নামে মুরগি ছেড়ে উৎসর্গ করে তারপর বাদায় প্রবেশ করতে হয়। মুসলিম কি সনাতন হিন্দু, বাঙালি কি আদিবাসী মুণ্ডা-মাহাতো বা বাগদী–সকলেই মা বনবিবিকে মান্য করে বাদাবনে।

আঠারভাটির পথ

বাদাবন দিনে চারবার রূপ বদলায়। দিনে দুইবার ভাটা ও দুইবার জোয়ার হয়। বাদাবনের দূরতম ও কঠিনতম অঞ্চলের নাম আঠারভাটির পথ। বনজীবীদের কাছে এটি এক পবিত্র অঞ্চল। ১৮টি ভাটি ও ১৮টি জোয়ার পাড়ি দিয়ে সে জায়গায় পৌঁছতে হয়। একটি বাঘ এক দিনে এই আঠারভাটির পথের সমান দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। বাদাবনের বহুল চর্চিত মা বনবিবির পালা ও পুঁথিতে বারবার এই আঠারভাটির পথের বিবরণ আছে।

বন থেকে গ্রামে উড়ে আসা মাছ

বাদাবনের নদীতে নানা জাতের মাছ। মাছের নামেই বাদাবনের স্থান নাম পরিচিত হয়েছে। পারশেখালী, কৈখালী, দাঁতিনাখালী, ভেটকীখালী, আমাদি, চিংড়াখালী। বাদাবনের এক বিশেষ মাছের নাম বাঙাশ। মাঝবয়সী কোনো বনজীবী নারীর ডান হাতের মাপে প্রায় চার হাত লম্বা হয় এই মাছ। বর্ষাকালে নদীতে এর আধিক্য বেশি থাকে। তবে শীতকালে এই মাছ বাদা থেকে উড়ে গ্রামে চলে আসে। বাদাবনের আশপাশের গ্রামে ধানের গোলা হয় উঠানের মাঝে। বাঙাশ মাছ ধানের গোলা থেকে ধান খেয়ে আবার উড়ে বাদায় ফিরে যায়। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে বাদাবন থেকে কেওড়া ফল ঝরে পড়ে নদীতে। ঝরে পড়া কেওড়া ও বাইন ফল খেতে আসে পাঙাশ মাছ। কেওড়াভোজী পাঙাশ গায়েগতরে বড় হয় এবং খেতে কিছুটা টক স্বাদের হয়ে পড়ে। পাঙাশ মাছের আকার ও ওজন দেখে বোঝা যায় কেওড়ার ফলন কেমন হয়েছে। মাছের আকার বেড়ে যাওয়া মানে কেওড়ার ফলন বেশি হওয়া। কেওড়ার ফলন বেশি হওয়া মানে বনে ফুলের পরাগায়ণ ভালো হয়েছে। পরাগায়ণ ভালো হয়েছে মানে মৌমাছিদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ আছে। মৌমাছিরা নিরাপদে আছে মানে মধু-মোমের পরিমাণও ভালো হয়েছে। মৌয়ালিরা যদি ভালোভাবে মধু আহরণ করে এবং জেলেরা মাছ ধরতে পারে তাহলে বন বিভাগও ভালো রাজস্ব পায়। বনজীবী পরিবারগুলোও ভালো থাকে। মাছ, ধান, মৌমাছি, মানুষ, বন বিভাগ–সব নিয়ে এক জটিল সংসার বাদাবন।

কেবল বাঘ, বনবিবি, বাগদা, বাউলে লতা নয়, এই সংসারের বাসিন্দা সুন্দরবননির্ভর বনজীবীরাও। বনজীবীরা নিজেদের পরিচয় দেয় 'বাদা করা লোক' হিসেবে, কখনো মৌলে-বাউলে। মৌয়ালি, বাওয়ালি, চুনারি, জোংরাখুটা, মাঝি, জেলে। এদের কেউ বন থেকে মধু ও মোম সংগ্রহ করে, কেউ গরানের ছিটে, কেউ গোলপাতা, কেউ মাছ, কেউ জোংরা। এই মানুষদের জন্ম কি মরণ–সবই এই বনের কোলে।

পাকলে খাওয়া যায় এমন কোনো ফল নেই

পাখি, হরিণ, বানর, মাছ বা পতঙ্গ বাদাবনের ফলমূল খেয়ে বাঁচে। তাদের অনেকেই কাঁচা ও পাকা ফল খেতে পারে। কিন্তু পাকলে মানুষ খেতে পারে এমন কোনো ফল নেই বাদাবনে। কেওড়া হলো বাদাবনের সবচেয়ে বেশি আহৃত ও ভোজ্য ফল। কেওড়া দিয়ে সুন্দরবনের আশপাশের গ্রামে নোড়া, আচার, টক নামের নানা পদের খাবার তৈরি হয়। কেওড়া, হেন্তাল, ধুতল, বাবলে, জানা, ছইলা, গোল, বান্দা, ঘড়িয়া ও হরিণআড়- গাছের ফল কাঁচা অবস্থায়ই খায় মানুষ। পাকলে এসব ফল মানুষ খেতে পারে না। তবে একমাত্র হরিণআড়ুর ফল পাকলেও কেউ কেউ খেয়ে দেখে। কাঁচা সুন্দরী ফল পোক্ত হলে সিদ্ধ করে কষ-পানি ফেলে দিয়ে এর শাঁস চিংড়ি মাছ দিয়ে রান্না করে খাওয়া যায়।

বাদাবনের উল্কি

বনজীবীরা উল্কি করাকে বলে 'ঠেংনা করা'। এটি বাদাবনের এক ধরনের প্রাচীন চিকিৎসারীতি। মানুষের 'লিভার' অসুখ হলে এটি করা হয়। লিভার হলে পেট বড় হয়ে যায়, বেশি বেশি খিদে পায়। পায়খানা অনিয়মিত হয়, পায়খানা পাতলা হয় এবং একসময় স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। বনজীবীদের গ্রামে গুনিনের বাড়িতে কোথাও বাঘ মারা গেলে সেখান থেকে এক টুকরো জিব (জিহ্বা) সংগ্রহ করে রাখা হয়। লিভারের চিকিৎসায় ঠুঁটে কলার ভেতর শস্যদানার পরিমাণ মরা বাঘের জিবের মাংস পুড়িয়ে ভরে খাওয়া হয়। পাশাপাশি হারগোজা গাছের শিকড় পুড়িয়ে হাতে ঠেংনা করা হয়। সাধারণত বাঁ হাতে এটি করা হয়। ঠেংনা করা হাত দুটি সাক্ষ্য দেয়, ব্যক্তিটি হয়তো বনজীবী পরিবারের কেউ এবং তার কখনো লিভার হয়েছিল।

সব গাছে মৌচাক হয় না

বাদাবনের গাছেরা নোনা জলের গাছ। এদের হুদো বা হুলো আছে। মাটির তলা থেকে ওপরে ওঠে আসা হুলো দিয়েই গাছরা শ্বাস নেয়। বাদাবনের প্রায় গাছের পাতাই রসে ভরপুর। পাতা টিপলে নোনা স্বাদের পানি বের হয়। অনেক গাছে ফলের পেটেই চারা জন্মায়। নানা জাতের গাছ হলেও সব গাছে মৌমাছি চাক বানায় না। মৌমাছিরা সবচেয়ে বেশি চাক বানায় কাঁকড়া, জানা, পশুর ও গেওয়া গাছে। এসব গাছে চাক বানানোর কারণ গাছগুলোর কাণ্ড চওড়া এবং তাদের আশপাশ খোলামেলা থাকে। কারণ এসব গাছ একাই বেশ খানিকাটা জায়গা নিয়ে বিস্তৃত থাকে। এসব গাছে চাক তৈরি করলে মৌচাকগুলো ভালো হাওয়া-বাতাস পায়। তার পরই মৌমাছিদের পছন্দ বাইন ও গরান। তুলনামূলকভাবে জানা, পশুর ও কাঁকড়া গাছে বানানো চাকের আকার বড় হয়। এসব চাকে অনেক মৌমাছি একসাথে থাকে। এদের সমাজ বড়। কিন্তু গরান গাছে বানানো চাক ছোট হয় এবং এখানে মৌমাছিদের সংখ্যাও কম থাকে, মধুও কম হয়। হেন্তাল ও হরগোজোর ঝোপও মৌমাছির প্রিয় আবাসস্থল, অনেক মৌচাক গেওয়া, ধুন্দল, পশুরের বড় বড় ঢোঁড়ের ভেতর দেখা যায়। কাঁকড়া গাছের ডালপালা সব সময় হেলা (বাঁকা) হয়ে লম্বা হয়, যা চাক বানাতে মৌমাছিদের পছন্দ। কারণ বাঁকানো ডালে ও ঝোপে চাক বানালে চাক টেকসই বেশি হয়। ঝড়, বাতাস ও জোয়ার থেকে সুরতি থাকে। চান্দা, বনলেবু ও গোল গাছে সাধারণত মৌমাছি চাক বানায় না। বনলেবুর গাছের ডাল

চিকন এবং গোলের ডাল পিচ্ছিল ও দ্রুত পচে যায়। চান্দা গাছের ডালের ছালে এক ধরনের গন্ধ আছে। এসব কারণে এসব গাছে মৌমাছি চাক বানায় না। সুন্দরী গাছ থেকে মধু সংগ্রহ না করলেও এই গাছের ধরন এমন যে মৌমাছি চাক বানাতে পছন্দ করে। হেন্তাল গাছের ঝোপে চাক বানাতে পছন্দ করে মৌমাছি, কারণ ঝোপের ভেতর সরাসরি রোদ লাগে না এবং জায়গাটি তুলনামূলকভাবে ঠাণ্ডা থাকে। সাতীরা রেঞ্জে গরান ও খলসি গাছ বেশি বলে মৌচাক বেশি ও মধু বেশি। তুলনামূলকভাবে খুলনা রেঞ্জে গাছদের উচ্চতা বেশি, তাই মৌমাছি সেখানে সাতীরা রেঞ্জের পর চাক তৈরি করে। বাইন ও সুন্দরী গাছে বানানো চাক থেকে মধু সংগ্রহ করা খুব কঠিন। গাছগুলো সোজা ও লম্বা ধরনের, গাছে ওঠার জন্য ধরার কোনো ডালপালা নেই।

ফুলের রঙে মধুর স্বাদ বদল

বাদাবনে একেক ফুলের একেক রং। আর ফুলের রঙেই বদলে যায় মধুর স্বাদ। জানা গাছের ফুল নীলচে সাদা, সুন্দরীর লাল, হরিণহাড়ুর ফুল লালচে, বাইনের লাল, গেওয়ার সোনালি, কিরপি-ঢালচাকা-পশুরের লালচে সাদা, কাঁকড়ার সবুজ, গোলের লালচে আর হরগোজার ফুল বেগুনি। এ ছাড়া বাদাবনের প্রায় গাছের ফুলের রংই সাদা। বাদাবনে প্রথমেই মাঘ মাসে ফোটে গরানের নীলচে ফুল ও তরার সাদা ফুল। খলসি ফুটতে শুরু করে ফাল্গুন থেকে। কিরপি, ঢালচাকা, পশুর, ধুন্দল, গুঁড়ে, কাঁকড়া, কালোলতা, হরগোজা, গোল, জানা, বনলেবু, কেয়া, লাটমে, সুন্দরী, ধানী, বাউলে লতা, বাঁকঝাঁকা, হরিণহাড়-, কেওড়া, বাইন, গেওয়ার ফুল ফাল্গুন-চৈত্র থেকে ফোটা শুরু হয় এবং প্রায় আষাঢ়-শ্রাবণ পর্যন্ত অনেকের ফুল থাকে। একফোঁটা মধু সংগ্রহ করতে একটি মৌমাছিকে প্রায় আশিটি ফুলে যেতে হয়। চাকের ভেতর এক কেজি মধু জমাতে মৌমাছিদের চাক থেকে ফুলে যাতায়াত করতে হয় প্রায় দেড় লাখ বার। নানা মধুর ভেতর আগুনে মৌমাছিদের চাকের পদ্মমধু স্বাদে ও গন্ধে সেরা। এটি খলসি ফুলের মধু। বাদাবনের প্রায় ফুল থেকে আহৃত মধু সাদা রঙের হলেও ঢালচাকার মধু লালচে এবং গেওয়ার মধু কিছুটা সোনালি আভার। গরান ফুল থেকেই পাওয়া যায় সবচেয়ে বেশি মধু, লাল রঙের এই মধুর স্বাদ ঝাঁজালো মিষ্টি। কেওড়ার মধু হালকা টক, গেওয়ার মধু একটা কষা তিতকুটে স্বাদের।

সুন্দরবন স্থানীয়ভাবে বাদা বা বাদাবন, হুলোবন, শুলোবন, মাল, মহাল হিসেবে পরিচিত। বাদা মানে জোয়ার-ভাটা বয়ে যায় যে বনে। ব্রিটিশ উপনিবেশের সময় এই বাদার নাম হয়ে যায় মহাল। মধুমহাল, গোলমহাল। বনের একেক অংশে একেক বন্যপ্রাণের বিচরণ। বাদাবনে পাখিদের বিশেষ আবাসস্থলকে বাদাল বলে।

গুটলিবৈচিত্র্য

গুটলি হলো পরাগরেণুর দলা। ফুল থেকে পরাগরেণু সংগ্রহ করে মৌমাছিরা গুটলি করে চাকে জমিয়ে রাখে। গুটলি দিয়ে তারা চাকের মুখ বন্ধ করে। এসব গুটলির ওপর নির্ভর করে চাকের স্থায়িত্ব। কোনো গুটলি বেশি আঠালো, কোনোটা ঝুরঝুরে। বৃষ্টি ও বাতাসের ঝাপটা থেকে গুটলিই মধুকে সুরা করে চাকের ভেতর। একেক ফুল থেকে সংগ্রহ করা গুটলিও একেক রকম। গেওয়া ও সুন্দরী গাছ থেকে সংগ্রহ করা পরাগরেণুর গুটলি হলুদ রঙের। কেওড়া ও গরানের গুটলি খয়েরি রঙের। বাইনের গুটলি হলদে-খয়েরি। চাকের গুটলির রং দেখেও বোঝা যায় চাকে কোন গাছ থেকে বেশি মধু সংগ্রহ করা হয়েছে। হেন্তাল গাছ থেকে মৌমাছিরা মধু সংগ্রহ করে না, শুধুমাত্র পরাগরেণু সংগ্রহ করে। তাই অনেক চাকে হেন্তালের গুটলি দেখা যায়।

মৌমাছিদের আত্মাহুতি

কখনো কখনো মৌমাছিরা দল বেঁধে নদীতে ঝাঁপিয়ে আত্মাহুতি দেয়। বাংলা ভাদ্র-আশ্বিন মাসে বেশি দেখা যায়। দেখা যায় ঝাঁক বেঁধে একদল মৌমাছি উড়ে উড়ে নদীর মাঝ বরাবর এসে তারপর পানিতে পড়ে যায়। তারপর পানিতে তাদের মৃতদেহ ভেসে ওঠে। তবে হেন্তাল ও হুদো গাছের ঝোপে যেসব চাক থাকে, চৈত্র মাসের গরমে সেসব চাকের মধু অনেক গরম হয়ে যায়। মধুর গরমে থাকতে না পেরে চাক থেকে মৌমাছিরা তখন বাইরে বেরিয়ে আসে।

বাঘের সংগম

বাদাবনে বাঘের সংগম সচরাচর দেখা যায় না। আশ্বিন-কার্তিক মাসের শেষে সাতীরা রেঞ্জে কোনো কোনো বনজীবী পুরুষ তা দেখেছে। সংগমের সময় মেছি বা মাদি বাঘ (নারী বাঘ) খুব উন্মত্ত থাকে। হলা বা মদনা বাঘ (পুরুষ বাঘ) শব্দ করতে থাকে। হলা বাঘের গায়ে পশম বেশি থাকে, তাই গায়ের ডোরাকাটা কম বোঝা যায়। দূর থেকে দেখতে হলুদ রঙের মনে হয়। মেছি বাঘে ডোরাকাটা বেশি বোঝা যায় এবং দেখতেও সুন্দর। বাঘের লিঙ্গ সোনালি বিড়ির মতো চিকন ও লম্বাটে ধরনের এবং এটি প্রায় এক হাত লম্বা হয়। সংগমের সময় বাঘের লিঙ্গ বের হয়। সংগমের সময় মদনা বাঘ মাদি বাঘের পেছন পেছন অনেকণ ঘোরাঘুরি করে এবং লাফিয়ে ওপরে উঠতে চায়। দুজনই বনের কাদায় আছাড়ি-পিছাড়ি খায় এবং কাদায় উভয়ের শরীর লেপ্টে যায়। সংগমের পর বাঘদের হলুদ-কালো ডোরাকাটা শরীর যেভাবে কাদায় মাখামাখি হয়, সচরাচর অন্য কোনো সময় এমন হয় না। কাদামাটিতে বাঘের পায়ের কড় বা ছাপ দেখে বোঝা যায়। সংগমের পর কড়গুলো স্পষ্ট সব বোঝা যায় না। মাটিতে থেবড়ে-আঁচড়ে যাওয়া কড়, কখনো গভীর হয়ে গর্ত হয়ে যাওয়া কড়। হুলো বাঘের পায়ের কড় মেছি বাঘের চেয়ে বড় হয়।

মানুষ খেতে পারে এমন কোনো পাতা নেই

কখনো কেউ কেওড়ার কচি পাতা চিবিয়ে দেখে। কিন্তু বাদাবনে কোনো গাছের পাতাই মানুষের খাওয়ার জন্য নেই। তবে বনের ভেতরের দিকে উঁচু জায়গায় কোথাও কোথাও বনপুঁই ও কলমি নামের গাছ আছে, যার পাতা ও ডগা বাদায় থাকাকালে বনজীবীরা রান্না করে খায়। সাগরের কাছাকাছি চরে অনেক সময় জেইত্তপালং বা জেইদ্দপালং নামের এক প্রকার গাছ দেখা যায়, যার পাতা শাক হিসেবে রান্না করে খাওয়া যায়। তবে খুবই বিরল এসব গাছ মূলত ছোট গাছ এবং বনে খুব একটা পাওয়া যায় না। বড় গাছের ভেতর কোনো গাছের পাতাই খাওয়া হয় না।

মাছদের ডিম-পঞ্জিকা

বাদাবনের নদীতে একেক মাছের আবাসস্থল একেক জায়গায়। নদীর ওপরের দিকে থাকে টেংরা মাছ। পায়রা, রুছো, কাইন ও ভেটকি মাছ থাকে মাঝ বরাবর। নিচের দিকে গভীর পানিতে থাকে মেদ মাছ। দাঁতিনা, পারশে ও চিংড়ি মাছ থাকে চরের কাছাকাছি। সব মাছের প্রজননকাল এক সময় নয়। প্রজনন ঋতুতে বনজীবী, বিশেষত জেলে ও বাগদী আদিবাসীরা মাছ ধরে না। অমাবস্যা ও পূর্ণিমা রাতেও মাছ ধরা হয় না। জ্যৈষ্ঠ মাসে ডিম ছাড়ে টেংরা ও কাইন মাছ। আষাঢ় মাসে ডিম ছাড়ে দাঁতিনা, শ্রাবণ মাসে পায়রা মাছ। মেদ ও আইড় মাছও শ্রাবণে ডিম ছাড়ে। পৌষ মাসে ডিম ছাড়ে পারশে মাছ। মাছ যখন ডিম ছাড়ে তখন পোনা মাছদের নিরাপদে বড় হওয়ার জন্য কয়েক দিন অপো করা হয়। ভাদ্র মাসে সাধারণত মাছ ডিম ছাড়ে না।

গোলবনে মাছের ঝাঁক

বাদাবনে নদীর তীর ধরে ধানী ঘাস, হেন্তাল, হরগোজা ও গোলপাতা জন্মে। গোলবনে মাছদের ঝাঁক বেশি দেখা যায়। বিশেষত পায়রা, পারশে, ভাঙ্গান, গলদা ও ছাটি চিংড়ি মাছ। গোলের ডাঁটায় যে শেওলা জন্মায় তা এসব মাছের খুব প্রিয়। বিশেষত বিকেলের দিকে এবং ভোরবেলা এসব মাছ ঝাঁক বেঁধে গোলবনের ভেতর থাকে। তাই অনেক জেলেকে ওই সময়গুলোতে গোলবনের ধারে ঝিম মেরে অপেক্ষা করতে দেখা যায়।

বনের বিস্তার

বাদাবনে মানুষ গাছ লাগায় না। এখানে জোয়ার-ভাটাই গাছ থেকে ঝরে পড়া ফল ও বীজ কাদামাটিতে পুঁতে দেয়। সেখান থেকেই চারাগাছ জন্মায়। জোয়ারের জলে ভেসে আসা বীজ ও ফল বনের ধারে চরের কাদামাটিতে আটকে যায়। কাদামাটিতে প্রথম জন্মায় ধানচি ঘাস। এসব ঘাস না থাকলে বীজ আটকাতে পারে না। যেসব ফল জোয়ারের স্রোতে বনের ভেতরে গিয়ে হুলোতে আটকায়, সেসব গাছের চারা সেখানেই জন্মায়। এভাবে দেখা যায়, জোয়ারের টান এবং ফলের আকার ও ওজন বনের একেক স্তরে একেক গাছের বীজ নিয়ে যায়। আর তাই বাদাবনে একেক স্তরে একেক গাছের জন্ম হয়। আবার বনের ভেতর কোনো কোনো গাছের চারা ফল থেকেই গজিয়ে নিচে কাদামাটিতে আটকে যায়। এভাবেই বাদাবনের বিস্তার ঘটে। বাদাবনে অধিকাংশ গাছেরই জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে ফুল হয় এবং আষাঢ় মাসে বীজ ঝরে পড়ে। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে বনতলজুড়ে নতুন চারা দেখা যায়।

> মাছের আকার বেড়ে যাওয়া মানে কেওড়ার ফলন বেশি হওয়া। কেওড়ার ফলন বেশি হওয়া মানে বনে ফুলের পরাগায়ণ ভালো হয়েছে। পরাগায়ণ ভালো হয়েছে মানে মৌমাছিদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ আছে। মৌমাছিরা নিরাপদে আছে মানে মধু-মোমের পরিমাণও ভালো হয়েছে।

ঢোঁড়

গাছের খোঁড়ল বা গর্তকে ঢোঁড় বলে। বাদাবনে সব গাছে ঢোঁড় হয় না। গেওয়া, পশুর, বাইন, কেওড়া, ধুতল গাছে ঢোঁড় বেশি হয়। আর এসব ঢোঁড় বন্যপ্রাণের আবাসস্থল। মৌমাছি চাক বানায় এসব ঢোঁড়ে। পশুর, বাইন ও কেওড়ার ঢোঁড়ে মধুর চাক বেশি পাওয়া যায়। বাইন ও কেওড়ার ঢোঁড়ে বনমুরগি বেশি থাকে। ধুতল ও পশুরের ঢোঁড়ে সাপ থাকে। বাইন গাছের ঢোঁড়ে তাইরকেল (গুইসাপ) বেশি থাকে।

গোন ও ভাটিকা

বাদাবনের সব কিছুই চন্দ্রনির্ভর। বনজীবীদের জীবন গোন ও ভাটিকার গণিত মেনে চলে। ছয় ঘণ্টা পর পর জোয়ার-ভাটা হয়। প্রতি মাসে অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথির তিন দিন আগে থেকে তিন দিন পর পর্যন্ত প্রায় এক সপ্তাহ হচ্ছে গোনমুখ। গোনমুখে বনজীবীরা বাদায় থাকে। এ সময় জোয়ারের প্রাবল্য বেড়ে যায়। প্রতি মাসে দুটি গোনমুখ আসে। প্রতি দশমী তিথিতে একটি নতুন গোনের জন্ম হয়। চতুর্দশী পর্যন্ত গোন থাকে। পঞ্চমী থেকে দশমী পর্যন্ত অমাবস্যা বা পূর্ণিমা হবে। গোনমুখের পর সাত দিন ভাটিকা পড়ে। ভাটিকার সময় বনজীবীদের গ্রামে থাকার নিয়ম। একটি গোনমুখ ও একটি ভাটিকা হয় পূর্ণিমা তিথিতে, পরের গোনমুখ ও ভাটিকা মিলে অমাবস্যা। ভাদ্রসংক্রান্তি থেকে শুরু করে আশ্বিনের শুরুতে হয় বছরের সবচেয়ে বড় গোনমুখ। একে বলে কলাকাটা গোন। ভাদ্র মাসের শেষ সপ্তাহে যে গোন হয় তাকে বলে পান্তাভাসান গোন। এই গোনেই বছরের সবচেয়ে বড় জোয়ার ওঠে। গোন ও ভাটিকা বাদাবনের জীবনে এমনই জড়িয়ে আছে। গোনমুখের সময় মহাজন থেকে বনজীবীরা যে টাকা ধারকর্জ করে তাকে বলে গোনমুখী দাদন বা গোনদাদন। গোনমুখের সময় চিংড়ি ও কাঁকড়া বেশি পাওয়া যায় এবং ভাটিকার সময় সাদা মাছ বেশি পাওয়া যায়। কোকো নামের এক পাখি আছে, যা জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে ডিম পাড়ে ও বাচ্চা ফোটায়। কোকো পাখি কু-কু-কু-কু করে ডাকে। কোকো পাখি ডাকলে বোঝা যায় ভাটিকা লাগার সময় হয়েছে।

রাতে গাছ ঘুমায়

দিনের বেলা গাছ সজাগ থাকে এবং রাতের বেলা ঘুমায়। রাতের বেলা গাছের শরীরে হাত দিয়ে তাকে জাগাতে নেই। এতে গাছ বিরক্ত হয়। রাতের বেলা গাছের পাতা ও ফল ছিঁড়তে নেই। এতে গাছ খুব কষ্ট পায়। রাতের বেলা গাছের গায়ের চাক থেকে মধুও সংগ্রহ করতে নেই। মূলত দিনের বেলায়ই সব কাজ করতে হয়। রাতের বেলা বাদা ঘুমিয়ে পড়ে। বনজীবীরা তাই সন্ধ্যার আগেই বন থেকে নৌকায় চলে আসে। রাতের বেলা বাদায় বনবিবি, দক্ষিণরায়–এরা ঘুরে বেড়ায়। দক্ষিণরায়ই বাঘের রূপ ধরে অনেক সময় মানুষকে আক্রমণ করে।

একেক গাছের একেক অংশ

বাদাবনের সব গাছই বনজীবীরা ব্যবহার করে না। সব গাছের সব অংশও ব্যবহৃত হয় না। গোলগাছের পাতা ঘর ছাওয়ার কাজে লাগে। হেন্তাল পাতা দিয়ে মধু সংগ্রহের সময় ধোঁয়া দিয়ে মৌমাছিকে চাক থেকে সরিয়ে দেওয়ার কারু বানানো হয়। কেওড়া ও গেওয়া গাছের পাতা ছাগলের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কেওড়া, হেন্তাল, ধুতল, বাবলে, জানা, ছইলা, গোল ও হরিণআড়- গাছের ফল কাঁচা অবস্থায় খায় মানুষ। সুন্দরী, গেওয়া ফলের বীজের শাঁস হাঁস-মুরগিকে খাওয়ানো হয়। পশুর, বাইন, গরান গাছের ডাল দিয়ে ঘরের বেড়া হয়। সুন্দরী ও পশুরের কাঠে আসবাবপত্র হয়। মধুর চাক কাটার দায়ের বাঁট/আছাড় বানানো হয় খলসি ও গেওয়া কাঠ দিয়ে। গরান ও কেওড়ার ডালপালা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। গরানের ছাল দিয়ে লাল রং বানানো যায় এবং কাপড় রাঙানো যায়। সুন্দরী গাছের ছাল বেটে মাথা ব্যথায় লাগানো হয়। গেওয়া ও সেজি গাছের আঠা দিয়ে মাছ ধরা যায়। হরগোজা ও কেওড়ার চারা জ্বালানি হিসেবে কাজে লাগে। পশুর গাছের শুলো দিয়ে নারীরা চামচ, হাতা–এসব নানা গৃহস্থালি জিনিস বানায় এবং বাচ্চারা খেলনা গুটি বানায়।

শুলো দিয়ে দম নেয় গাছ

বাদাবনের গাছরা শুলো বা হুলো দিয়ে দম নেয়। বাদাবনে সবচেয়ে লম্বা শুলো হয় সুন্দরী গাছের। আদিবাসী মুণ্ডার নারীর কোমর সমান উচ্চতার। মাথা ভোঁতা। সুন্দরীর পর কেওড়ার শুলো বড় হয়। তবে অনেক সময় বাঁক নিয়ে নিয়ে কেওড়ার শুলো মাটিতে গুচ্ছাকারে ছড়িয়ে যায়। পশুরের শুলো বেশ চওড়া ও মোটা এবং প্রায় অর্ধেক চাঁদের মতো দেখতে। বাইনের শুলো খুব ছোট ও কালো রঙের এবং চিকন। এসব শুলো বাদায় হাঁটার সময় পায়ে খুব লাগে। বাইন গাছের লম্বা ও মোটা শিকড় হয়। এই শিকড় ঠেস দিয়ে মাটিতে বিস্তার লাভ করে।

বনের খাবার

বনবাসীরা বনের গাছপালা ও বন্যপ্রাণের ওপর একে অপরে নির্ভর করে। বানর কেওড়ার ফল, ধানচি গাছের শিকড়, কেওড়ার ছোট শুলো,

হেন্তাল গাছের মাথি খায়। কেওড়া, পশুর ও গেওয়ার পাতা হরিণের প্রিয়। হরিণ কেওড়া, হেন্তাল ও আমু গাছের ফলও খায়। খলিস ও বাইনের পাতাও খায় হরিণ। সুন্দরী গাছে জন্মানো চিলি নামের পরগাছার পাতাও হরিণ খায়।

বোঝাই পোকা ও খালিন পোকা

গাছ থেকে মধু খেয়ে এবং সংগ্রহ করে যেসব মৌমাছি চাকের দিকে ফিরে আসে তাদের বোঝাই পোকা বলে। এসব পোকা চাক বরাবর উড়ে আসে, অন্য কোনো দিকে তারা যায় না। তাদের শরীর ভার থাকে। শরীরে একটা ভাব থাকে। চাক থেকে মধু সংগ্রহ করতে বের হওয়া মৌমাছিদের খালিন পোকা বলে। তারা মধু সংগ্রহ করতে যাওয়ার আগে চাকের নানা দিকে ঘোরাফেরা করে অন্যদের দেখায় কোথায় ভালো মধুর উৎস আছে। মৌপোকাদের এই নাচ খুব সুন্দর লাগে দেখতে। তারা সোজা যায় না, তাদের শরীর হালকা থাকে। বোঝাই পোকা দেখে তাদের পেছন পেছন এলে মধুর চাক পাওয়া যায়।

মৌপোকাদের নাচ

বনে গাছে গাছে ফুল ফুটলে বনজুড়ে মৌমাছিরা নাচে। প্রতিটি মৌচাকে নানা জাতের মৌপোকা থাকে। প্রতিটি চাকের প্রধান পোকাটি থাকে অনেক বড়, এর কাজ শুধু বাচ্চা জন্ম দেওয়া। এই পোকাকে মাইয়ে পোকা বা আলসি পোকা বলে। এই পোকা কখনোই মধু আনতে যায় না। মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করার সময় খুব সাবধানে প্রথমেই চাকের ভেতর এই আলসি পোকা ও চাকের বাচ্চা পোকাদের বাঁচাতে হয়। মৌয়াল পরিবারে ছোট থেকেই এই শিক্ষা দেওয়া হয়। চাকের যে অংশে পোকারা থাকে সেই অংশটি খুব যত্ন করে সুরা করা হয়। কারু জ্বালিয়ে ধোঁয়া দিয়ে চাকের মধু জমানো অংশের বড় মৌমাছিদের তাড়ানো হয়। আলসি পোকাকে পবিত্র প্রাণ হিসেবে দেখা হয়। আলসি পোকা ও বাচ্চা পোকাদের মারলে পাপ হয় এবং মা বনবিবি রুষ্ট হন। এসব পোকা না বাঁচলে নতুন চাক হবে না, চাক না হলে মধু হবে না। মৌপোকারা বন ঘুরে ঘুরে মধুর সন্ধান করে। কোথায় কেমন জাতের মধু আছে তার নমুনা নিয়ে আসে। তারপর চাকের কাছে এসে নেচে নেচে মধুর উৎসস্থল কোথায় আছে তা দেখায়। মৌপোকার নাচন দেখে বনের কোন অংশে কেমন ফুল ফুটেছে তা বোঝা যায়।

বনবাসীরা বনের গাছপালা ও বন্যপ্রাণের ওপর একে অপরে নির্ভর করে। বানর কেওড়ার ফল, ধানচি গাছের শিকড়, কেওড়ার ছোট শুলো, হেন্তাল গাছের মাথি খায়। কেওড়া, পশুর ও গেওয়ার পাতা হরিণের প্রিয়। হরিণ কেওড়া, হেন্তাল ও আমু গাছের ফলও খায়। খলিস ও বাইনের পাতাও খায় হরিণ। সুন্দরী গাছে জন্মানো চিলি নামের পরগাছার পাতাও হরিণ খায়।

মধুর চাক না কাটলে কী হবে

শ্রীপঞ্চমীর দিন মৌপোকারা উড়ে আসে বাদাবনে। বন ঘুরে ঘুরে চাক বানানোর গাছ পছন্দ করে। এ সময় তারা আড়াইঘর চাক তৈরি করে প্রথম। প্রতিবছর নিয়ম করে মৌয়ালরা মধুর চাক না কাটলে পরের বছর মৌচাক ও মধুর পরিমাণ অনেক কমে যাবে। একফোঁটা হলেও মধুর চাক কেটে ঝরাতে হবে। মধুর চাক থেকে মধু সংগ্রহ করা হয় বলেই মৌমাছিরা আবার মধু সংগ্রহ করে। তা না হলে চাকে জমা মধু খেয়ে খেয়ে তারা অলস ও ভারী পোকা হয়ে যায়। এভাবে তাদের শক্তি কমে যায়। মৌমাছিরা যদি অলসভাবে চাকে বসে থাকে এবং বনের ফুলে ফুলে না যায় তাহলে গাছের মিলন বন্ধ হয়ে যাবে। মৌমাছির চাকে গুটলি দেখেই বোঝা যায় কেমন মিলন হয়েছে বনের গাছে। ঠিক একইভাবে এক বছর গোলপাতা না কাটলে, গোলের ঝাড় পরিষ্কার করে না দিলে পরের বছর গোলপাতা জন্মাবে কম। গোলের মাইঝ পাতা রেখে নিয়ম করে কাটতে হয়। পাতা না কাটলে এমনিতেই মরে শুকিয়ে পচে গিয়ে তা নতুন পাতার বৃদ্ধি ও বিকাশে বাধা দেয়।

বাঘ-কুমিরের কামড় শনাক্তকরণ

কিভাবে বোঝা যায় বাঘ না কুমির কামড় দিয়েছে? বাঘের কামড়ে ক্ষতস্থান ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পচে যায়। আক্রান্তের শরীরে এক ধরনের বোঁটকা গন্ধ হয়। গাল দিয়ে অনবরত নাল (লালা) ঝরে। আক্রান্ত স্থানটি পচে সাদা ঘা হয়ে যায় এবং সেখান থেকে এক ধরনের মাছি পোকার জন্ম হয়। আক্রান্ত স্থানে খিলেন দাঁতের দাগ থাকে। আক্রান্ত স্থানটি একেবারে কুড়াল দিয়ে কেটে নেওয়ার মতো মনে হয়। বাঘের আক্রমণ অধিকাংশ সময়ই বোঝা যায় না, কারণ বাঘকে দেখা যায় না। ঘটনাটি খুবই দ্রুত ও চোখের নিমেষে ঘটে। কিন্তু সচরাচর পানিতেই কুমির ও কামটে কামড়ায়, তাই সেখানে বোঝা যায়। কুমিরের কামড়ে আক্রান্ত স্থানে আট পাটি দাঁতের বড় গর্তঅলা দাগ থাকে। কুমির মাংস কামড় দিয়ে তুলে নিয়ে যায়।

বাঘ ও কুমির বন্দনা

বাদাবনে জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ। বাঘ ও কুমির মানুষের আরাধনা ও বন্দনার অংশ। বাদাবনের রক্ষাকবচ মা বনবিবির বাহন হলো বাঘ। বনবিবি পূজার সময় মাটি দিয়ে বাঘ বানানো হয়, তার ওপর চেপে বসেন বনবিবি। চৈত্র মাসে বাদাবনের ধর্মদেল উৎসবে মাটি দিয়ে কুমির বানানো হয়। কুমির, ধনামনা, সাগরপিড়ি, সূর্যপিড়ি, কামদেব, নীলদেব, মালঞ্চ মাটি দিয়ে বানানো হয়। ধানজমিন বা পুকুরের নরম মাটি দিয়ে কুমির বানানো হয় এবং সারা শরীরে খেজুর ফল গেঁথে দেওয়া হয়। বনবিবির পূজা ও ধর্মদেল উৎসবে বাঘ ও কুমিরের সুস্থ থাকার জন্য প্রার্থনা করা হয়। পাশাপাশি বাঘ ও কুমির যাতে মানুষের কোনো ক্ষতি না করে এ জন্যও আবদার করা হয়। বাদাবনে কুমিরকে সাধারণত গন্ধকালী হিসেবে দেখা হয়। ত্রেতা যুগে গন্ধকালী নাচতে নাচতে একদিন ধনপতি কুবেরের বাড়ি যান। কিন্তু নাচতে নাচতে তাঁর পা লেগে যায় কুবের মুনির শরীরে। মুনির অভিশাপে গন্ধকালী কুমির হয়ে গন্ধমাদন থেকে বাদাবনে চলে আসেন। পাশাপাশি বাদাবনে বাঘকে মনে করা হয় দক্ষিণ-রায়।

মানুষশিকারি বাঘ

বাঘ যখন মানুষ আক্রমণ করে তখন মনে করা হয়, দক্ষিণরায় বাঘের রূপ ধরে সেটি করেছেন। বাঘ অসুস্থ হলে বা দীর্ঘ সময় রোগে ভোগার পর কিংবা আহত হলে এবং বয়স বাড়লে আশপাশে শিকার ধরতে না পেরে মানুষের ওপর আক্রমণ করে। কারণ তুলনামূলকভাবে মানুষকে আক্রমণ করা সহজ। একবার বাঘ মানুষের শরীরের রক্তের স্বাদ পেলে সে আর তা না খেয়ে থাকতে পারে না। মানুষের রক্তে বাঘের বুদ্ধি ও শক্তি বেড়ে যায়। বাঘ তখন উন্মত্ত হয়ে ওঠে। বাদা থেকে নদী সাঁতরে মানুষের গ্রামে চলে আসে। হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল ধরতে গিয়ে অনেক সময় মানুষের হাতে বেঘোরে প্রাণ হারায়। মানুষশিকারি বাঘ চলার সময় একেবারেই কোনো শব্দ করে না। এমনকি কাদামাটিতে তার পায়ের কড়ও স্পষ্টভাবে পড়ে না। কারণ হাঁটার সময় সে পা পাক দেয়, তাই ছাপ থেবড়ে যায়। বাঘ যখন প্রথম মানুষ আক্রমণ করে শিকার করে, তখন সেই বাঘের ভেতর এক ধরনের উত্তেজনা থাকে। বাঘের তখন পেছনের পায়ের দুই উরু অনবরত কাঁপতে থাকে। বাঘ ফিনকি

দিয়ে ছোটা রক্ত চেটে চেটে খায়। প্রথমবার বাঘ মাংস কামড়ে ছিঁড়ে খায় না। রক্ত খায় আর একটু পর পর পানি খেতে যায়। কয়েক দিন ধরে বাঘটি লাশের কাছে থাকে, যদি লাশটি সরিয়ে নেওয়া না হয়। তারপর সে মাংস কামড়ে খাওয়া শুরু করে। কিন্তু প্রথমবার শিকারের পর বাঘের পা কাঁপা কমতে থাকে। যে বাঘ যত বেশি মানুষ শিকার করে, ধীরে ধীরে এই পা কাঁপা বন্ধ হয়ে যায়। বাঘের পায়ের কড় দেখেও বোঝা যায় এটি মানুষশিকারি বাঘ কি না। এমনি বাঘের পায়ের কড় থেকে মেছি ও হুলো শনাক্ত করা যায়। কিন্তু মানুষখেকো বাঘের ক্ষেত্রে মেছি ও হুলো শনাক্ত করা কঠিন। তাদের বাঁ পায়ের কড়ে পাঁচটি আঙুলের ছাপ এবং ডান পায়ের কড়ে চারটি আঙুলের ছাপ দেখা যায়। মানুষশিকারি বাঘ বেশিদিন বাঁচে না। কারণ সে বেশিদূর দৌড়ে যেতে পারে না, খাবার খাওয়ার পর অলস বসে ঝিমায়। মানুষশিকারি বাঘের ঘুম ভালো হয় না। শরীরে একটা ঝিমুনি এসে যায়। মানুষশিকারি বাঘের কোনো কারণে মাথা ও কপালে ঘা হলে সে আর বাঁচে না। কারণ বাঘ নিজের জিব দিয়ে সারা শরীর পরিষ্কার করে ও চাটে। জিব উল্টিয়ে মাথা ও কপাল চাটা সম্ভব হয় না বলে এই ঘা ভালো হয় না এবং শরীরে ছড়িয়ে যায়।

বাঘ মানুষের যে অংশ প্রথম খায়

প্রাণিকুলের ভেতর বাঘ হচ্ছে হিংসা জাইত। কারণ বাচ্চা হওয়ার পর অনেক সময় নিজের বাচ্চাদেরও খেয়ে ফেলে হুলো বাঘ। তবে মেছি বাঘ বাচ্চাদের সামলে রাখার জন্য যুদ্ধ করে। মানুষশিকারি বাঘ মানুষকে আক্রমণ করলে প্রথমে ফিনকি দিয়ে ছোটা রক্ত খায়। তবে এর পর থেকে শরীরের মাংস খাওয়া শুরু করে। বাঘে ধরলে প্রথমেই পুরুষদের ক্ষেত্রে পুরুষাঙ্গ এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে স্তন খায়। পুরুষাঙ্গ ও স্তন দিয়েই বাঘ খাওয়া শুরু করে। সাধারণত বাঘ মানুষের মাথা খায় না। কোমরের নিচের অংশ থেকে পা পর্যন্ত, পেট এবং ঘাড়ের অংশ–এসবও খায়। বাঘ সাধারণত মানুষের ভেতর পুরুষদেরই বেশি আক্রমণ করে। বাঘ নারীদের মাংস খায় না। যদিও বাঘের আক্রমণে কিছু নারীর মৃত্যু হয়েছে, তবে বাঘ তাদের শরীর খায়নি। বাঘ নারীদের খায় না কারণ নারীরা সব সময় হক খায়, পাপ করে না। তারা এমনি এমনি কোনো জিনিস জোরজবরদস্তি করে তুলে নেয় না, চুরি করে না। এসব কারণে বাঘ নারীদের খায় না। মানুষের ঘাড়ে শরীরের সব শিরা এসে জোড়া লাগে। বাঘ যখন পেছন থেকে কোনো মানুষকে আক্রমণ করে তখন ঘাড়ে কামড় বসায় এবং ঘাড় মটকে দেয়। মানুষ তখন বিড়ালের মতো ছটফট করে অজ্ঞান হয়ে যায়। বাঘের নলি (নখ) ও দাঁত অনেক বড়, তা মানুষের ঘাড়ে ঢুকিয়ে দেয়।

জঙ্গলে জোংড়া পোড়ানো যায় না

বাদাবন থেকে জোংড়া নামের ঝিনুকজাতীয় এক প্রকার প্রাণী সংগ্রহ করা যেত। মূলত চুন বানানোর জন্য চুনারি ও জোংড়াখুঁটারা এসব সংগ্রহ করত। জোয়ারের পানিতে ভেসে আসা জোংড়া নদীর চরে, গোলফলের ডাঁটায় এবং বড় গাছের কাণ্ডে লেগে থাকত। জোংড়া সংগ্রহকারীরা শীতের সময় বেশি জোংড়া পায়। ভাটার সময় জোংড়া সংগ্রহ করা হতো। জোংড়া খুঁটতে গিয়ে অনেকে বাঘের কামড়ে মরেছে। বাড়িতে এনে চুন বানানোর জন্য জোংড়া ধুয়ে তারপর শুকিয়ে পোড়ানো হয়। পোড়ানো ছাই থেকে চুন তৈরি হয়। জঙ্গলে কোনোভাবেই জোংড়া পোড়ানো হয় না, কারণ সেখানে সেটি পোড়ে না। কাঁচা জোংড়া পোড়ালে সাঁ সাঁ শব্দ হয়। বাড়ি ফিরেই জোংড়া পোড়ানো হয়।

মানুষ বাদায় পড়ে

বাদাবনে বাঘের আক্রমণে মানুষ মারা গেলে কখনোই বলা হয় না বাঘে মেরেছে বা বাঘে খেয়েছে। বলা হয়, মানুষটি বাদায় পড়েছে। সাধারণত বাওয়ালি ও জেলেদের চেয়ে মৌয়ালিরাই বেশি বাদায় পড়ে। মৌয়ালিরা মধুর চাক খোঁজার জন্য গাছের ওপরের দিকে তাকিয়ে হাঁটে, তাদের দৃষ্টি ওপরের দিকে থাকে বলে বাঘ পেছন থেকে আক্রমণ করতে পারে। তবে বনজীবী নারীরা নদীতে যখন মাছের পোনা ধরে তখনো তাদের পেছন লাগোয়া বন থাকে, কিন্তু বাঘ খুব কমই এমন নারীদের আক্রমণ করে। বনে বাঘের উপস্থিতিকে বলা হয় 'বাদা গরম', মানে জঙ্গলে ধারেকাছে বাঘের উপস্থিতি আছে। কখনোই বলা হয় না জঙ্গলে বাঘ আছে।

জঙ্গলেই মঙ্গল

জঙ্গলই জীবনের পাঠশালা, জঙ্গলই জীবনের চিকিৎসাঘর। সব বালা-মুসিবত সামলানোর হদিস জঙ্গলে আছে। বাঘে আঁচড় দিলে বা কামটে কামড়ালে হেন্তাল পাতার রস লাগাতে হয়, গরানের শিকড় কাটাছেঁড়ায় সাথে সাথে রক্ত বন্ধ করে, আমাশয়ে খলসির ছাল বেটে রস বা জ্বর হলে পশুর পাতার রস গরম করে খেতে হয়। জঙ্গলে হাত-পা কাটলে গরান ফুলের পরাগরেণু কাটা ক্ষতে লাগানো হয়। জঙ্গলে পিপাসা লাগলে চিলে গাছের ডাঁটা ছিলে চিবিয়ে খেলে পিপাসা মেটে। মুণ্ডা আদিবাসীরা বাদাবনের সিন্দ্রি বা সুন্দরী গাছের পাতা সারহুলপূজায় ব্যবহার করে। গনগনে মাছ খেলে প্রসূতি মায়ের বুকে দুধ বাড়ে। মেন মাছ পরুষের শরীরের বল বাড়ায়। বাদায় প্রবেশের আগে বনজীবীরা শরীরে পশুর পাতার রস মেখে নেয়। এই রস গায়ে মাখলে বারী পোকা কামড়ায় না। বাদাবন থেকে সংগৃহীত বছরের প্রথম মধু হয় সাধারণত খলসি বা খলিসা ফুলের। বছরের প্রথম চাককাটা মধুকে ফুলপটি মধু বলে। এই মধু পূজাকৃত্য ঔষধ উৎসবের জন্য আলাদা করে রাখা হয়। নৌকাপূজার সময় এই ফুলপটি মধু দিয়ে নতুন নৌকাকে স্নান করানো হয়। ফুলপটি মধুমাখা নৌকার ভেতর বিপদ মোকাবেলার শক্তি জন্মায়। আর এই নৌকা দিয়েই তো বাদাবনে ঘুরে বেড়াতে হয়।

বাদাবনে বাঘের আক্রমণে মানুষ মারা গেলে কখনোই বলা হয় না বাঘে মেরেছে বা বাঘে খেয়েছে। বলা হয়, মানুষটি বাদায় পড়েছে।

শঙ্খ লাগা

বাদাবনে প্রাণিকুলের সংগমকে বলা হয় 'শঙ্খ লাগা'। যখন এই সংগম মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীতে প্রাণীতে ঘটে, সে এক মধুর মিলন! ভরপুর অমাবস্যা কি পূর্ণিমার সময় কাইন মাছ ও টেপা মাছের সাথে সংগম হয়। সাপ ও মাছের এই শঙ্খ লাগা দীর্ঘ সময় ধরে চলে। তখন কেউ এ সময় তাদের অবিচার করে না, বিরক্ত করে না। বাদাবনের কাইন ও টেপা মাছ নাভি ফেলে রান্না করা হয়। কারণ সাপের সাথে এসব মাছের শঙ্খ (সংগম) লাগে। এসব মাছের বিষ থাকে নাভিতে। বাদাবনের নারীরা জানে কিভাবে এই বিষনাভি সরিয়ে ফেলতে হয়। তুলনামূলকভাবে শীতকালে বিষনাভিতে বেশি বিষ জমে।

বাদাবনের মন্ত্র

বাদাবন থেকে যে কোনো কিছু আহরণ ও সংগ্রহ করতে হলে বনের কাছে অনুমতি নিতে হয়। মা বনবিবির কাছে এই অনুমতি নিতে হয়। সাধারণত গুনিন বাওয়ালিরা বনে প্রবেশের অনুমতি নেন। তাঁরা নানা

ধরনের মন্ত্র দিয়ে এই কাজটি করেন। বনবিবি, গাজী-কালু, চম্পাবতী, আলীবদর, খোয়াজখিজির, দুখে, শাহ জঙ্গলী, দক্ষিণরায়, রায়মণি, বড় খাঁ–এদের কাছে প্রার্থনা করা হয়, যাতে বাদায় কোনো বিপদ-আপদ না ঘটে। বনবিবির কাছে প্রার্থনা করা হয়, যাতে একযাত্রায় জুটে যায় বছরের খোরাক। গুনিন বাওয়ালিরা খিলান মন্ত্র, ছুকে মন্ত্র, চালান মন্ত্র দিয়ে বনের সুন্দরী গাছের গায়ে 'মাল' করেন। এটি বনের কাছে বনজ দ্রব্য সংগ্রহের অনুমতি প্রার্থনার প্রথম কৃত্য। বাদা রাকারী বনবিবি এই 'মাল' কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত করেন, মালের সীমানায় যেন কোনো আপদ-বিপদ না ঘটে।

সবারই কর্মভাগ আছে

কর্মগুণে কেউ মাছ, কেউ বাঘ, কেউ গাছ আর কেউ মানুষ। বাদাবনে সকলেরই কর্মভাগ আছে। একটি মৌচাকে একেক মৌপোকার একেক রকম কাজ। তেমনি একটি মৌয়াল দলের প্রত্যেকে নিজেদের ভেতর আলাপ-আলোচনা এবং পূর্ব-অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে নিজেদের দলগত কর্মবিভাজন তৈরি করে। দলের সকলে মিলে দলপ্রধান নির্বাচন করে। মৌয়াল দলের দলপ্রধানকে সাজুনি বা মাঝি বলা হয়। সাত থেকে দশজনের একটি দল তৈরি হয়। কিন্তু গোল-গরান আহরণের ক্ষেত্রে আটজনের দল থাকে। গোলপাতা কাটতে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাওয়ালি দলের প্রধানকে মাঝি বলে। আটজনের ভেতর চারজন গোলের পাতা পছন্দ করে সেই পাতা নিয়মমতো কেটে নেয়, এরা কাটনি বাউলি। বাকি চারজনের কাজ হচ্ছে সেইসব পাতা ফেড়ে নৌকা বোঝাই করা, এরা ফাড়া বাউলি। এ ছাড়া দলে একজন বাবুর্চিও থাকে, যে রান্না সামলায় এবং নৌকার তদারকি করে। মৌয়াল দলে সাজুনি ছাড়া কাটনি বাউলি থাকে দুজন। কাটনি বাউলিদের মূল কাজ হচ্ছে মধুর চাক কাটা। একটি দলে দুজন আড়ি বাউলি থাকে, যারা মধু কাটার সময় চাকের নিচে বাঁশ-বেতের তৈরি আড়ি ধরে রাখে। তারাই মধু ও মধুর চাক বন থেকে বহন করে নৌকায় এনে বোঝাই করে। একটি দলে একজন বাবুর্চি বা ভার বাওয়া লোক থাকে। তার কাজ হলো নৌকায় বসে সকলের জন্য রান্নাবান্না করা। খাল থেকে তীরের কাছাকাছি এলাকার জ্বালানি সংগ্রহ করা। যখন সবাই মধু ও মোম খুঁজতে বনের ভেতর চলে যায়, তখন এই বাবুর্চি রান্নাবান্না করে নৌকা বেয়ে নৌকা দলের কাছাকাছি নিয়ে যায়। দলে একমাত্র বাবুর্চিই শিঙ্গা বাজায়। এই শিঙ্গা দলের অবস্থান জানার জন্য আবার কখনো কখনো বেশি মধু-মোম প্রাপ্তির আনন্দ প্রকাশের জন্য। একটি মৌয়াল দলের সকলকেই নৌকা বাইতে হয়। দলের সাজুনির কাজ হচ্ছে বন বিভাগ থেকে বনে প্রবেশ ও আহরণের আইনগত অনুমতি সংগ্রহ করা। দলের নেতৃত্ব ও পরিচালনা করা। কখনো কখনো সাজুনি মধু কাটে এবং বনের ভেতর বা নৌকায় এনে মৌচাক চাপে।

মালযাত্রার নিয়ম

বাদাবনে বনজ সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে মালযাত্রায় যাওয়ার আগে পরিবার-পরিজনের বাজার-সদাই, খরচাপাতি সব দিয়ে যায়। কারণ একবার মালযাত্রা থেকে গ্রামে ফিরতে ফিরতে এক সপ্তাহ থেকে পনেরো দিন লেগে যায়। এই দীর্ঘ সময় পরিবারের নারীরাই ঘর-সংসারের যাবতীয় দিকগুলো সামলায়। মালযাত্রার আগে বনজীবী সনাতন হিন্দু পরিবারের মালযাত্রীরা বেশ কিছু নিয়ম পালন করে। মালযাত্রীরা তেল-মসলাজাতীয় খাবার বা নেশাজাতীয় খাবার গ্রহণ করে না। শরীর অসুস্থ হয় বা শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ে এমন কাজ করা থেকে মালযাত্রার আগে কিছুটা বিরত থাকা হয়। শুক্রবার বাদাবনে বনবিবির দিন। এদিন মা বনবিবি বাদায় বের হন। তাই শুক্রবার বাদায় নামে না কেউ। এদিন বন থেকে কোনো কিছু সংগ্রহও করা হয় না। মালযাত্রার আগে শুক্রবার সনাতন হিন্দু পরিবারের অনেকেই উপবাস থাকে। আবার হিন্দু কি মুসলিম বনজীবী পরিবারের নারীরা যত দিন তাদের পরিবারের পুরুষ সদস্যরা বাদায় থাকে তত দিনই রোজা রাখে এবং উপবাস পালন করে। যত দিন পরিবারের পরুষ সদস্যরা বাদায় থাকে তত দিন বনজীবী পরিবারের নারীরা মাথায় তেল মাখে না এবং সাবান ব্যবহার করে না। যত দিন পরিবারের পুরুষ সদস্যরা বাদাবনে থাকে তত দিন চুলার ছাই বাইরে ফেলা যায় না। মাটিতে দা বা ধারালো কিছু দিয়ে আঁচড় কাটা হয় না। এ সময় কোনো কিছু ঋণ বা কর্জ করে আনা যায় না। মালযাত্রায় যাওয়ার সময় পরিবারের নারীরা গুনগুনিয়ে গান করে।

হাজার হাজার বছর ধরে বাদাবনে টিকে থাকার ভেতর দিয়েই বিকশিত হচ্ছে এখানকার লোকায়ত জ্ঞানকাণ্ড। বনজীবী নিম্নবর্গের যাপিত জীবনের ময়দান থেকে আসুন একটিবার বিশ্বের বৃহত্তম বাদাবনকে জানা-বোঝার চেষ্টা করি। বাদাবনের করুণ রক্তদাগ আর আহাজারির পাশে শামিল হই।

আসুন, নতজানু হই

এভাবেই নানাভাবে নানা ব্যঞ্জনায় বিশ্বের বৃহত্তম বাদাবনের বনজীবীরা বিকশিত করে চলেছে এক জীবনদায়িনী বিজ্ঞানভাষ্য। বিস্ময়কর ও নির্দয়ভাবে বাদাবনের বনজীবীদের এই অরণ্যভাষ্য কখনোই কোনো দিন তথাকথিত মূলধারায় স্বীকৃতি বা গুরুত্ব পেল না। অথচ এখানেই আছে টিকে থাকার কারিগরি এবং বেঁচে থাকার দর্শন। চলতি আলাপখানি ওপরে বর্ণিত বিষয়গুলোর কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে যাচ্ছে না। কারণ এসব নিয়ে বিস্তর বহুমাত্রিক-বহুপাকি তর্কতালাশ সম্ভব। কিন্তু এটি তো মানতেই হবে, হাজার হাজার বছর ধরে বাদাবনে টিকে থাকার ভেতর দিয়েই বিকশিত হচ্ছে এখানকার লোকায়ত জ্ঞানকাণ্ড। বনজীবী নিম্নবর্গের যাপিত জীবনের ময়দান থেকে আসুন একটিবার বিশ্বের বৃহত্তম বাদাবনকে জানা-বোঝার চেষ্টা করি। বাদাবনের করুণ রক্তদাগ আর আহাজারির পাশে শামিল হই। আসুন, চুরমার করি সুন্দরবন নিয়ে প্রবল জ্ঞানকাণ্ডের বাহাদুরি। সুন্দরবন কোনো বিচ্ছিন্ন করে রাখার মতো উদ্ভিদ উদ্যান বা নয়া-উদারবাদী উন্নয়ন প্রকল্পের ময়দান নয়। এটি বাঘ, বনজীবী, বনবিবিদের এক জটিল ঐতিহাসিক সংসার। এই সংসার যেমন দেশকে আগলে আছে, আগলে আছে দুনিয়াকেও। দেশ ও দুনিয়ার প্রতি আসুন নতজানু হই, কৃতজ্ঞ হই।

.....

বিশেষ ঘোষণা : চলতি আলাপে উপস্থাপিত সকল তথ্য, উদাহরণ ও বিবরণের মালিক সুন্দরবনের বনজীবী জনগণ। এসব জ্ঞান ও তথ্যের কোনো একতরফা বাণিজ্যিক ব্যবহার মেধাস্বত্ব অধিকার লংঘন হিসেবে বিবেচিত হবে।

পাভেল পার্থ: গবেষক, প্রতিবেশ ও প্রাণবৈচিত্র্য সংরণ।
ইমেইল: animistbangla@gmail.com